পরিক্রমা

বিধেহি দেবি কল্যাণম্

আশ্বিনের কয়েকটা দিনের জন্য মনে মনে প্রতীক্ষায় থাকে বাংলার মানুষ। ঘরে ঘরে শিশুর যেমন মা আছে, এই বিশ্বে প্রতিটি জীবের তেমনই মা আছেন। মায়ের কোলভরা শিশু যেমন নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে আনন্দে খেলা করে, তেমনি বিশ্বজননীর ব্রহ্মাণ্ডজোড়া কোলেও পরম আশ্বাসে জগৎশিশু ঘুমোয়। আকাশভরা সূর্য-তারার আলোয় জীবের চোখ ফোটে—সে-আলো চমকে ওঠে জগজ্জননীর ভালে, আঁখিতে ও মুখাবয়বে। জেনে না জেনে শিশু দেয়ালা করে। এই জগজ্জননীকে চিনতে, জানতে সাধক সাধনায় বসেন। মাকে চেনার সাধনা করতে করতেই শ্রীরামপ্রসাদ লিখলেন—''মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।'' মা যে চিন্ময়ী! চৈতন্যের প্রভায় জাগ্রত সেই মাতৃমূর্তি—''অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড়-বিচালি?/ সে ঘুচাবে মনের কালি...।'' কথা ও ভাবের তুলি দিয়ে তাঁর আরাধ্যা দেবীকে সাধক এঁকে দিয়েছেন মানুষের মানসপটে।

শরৎ ও চৈত্রমাসে পূজিতা মহাদেবীর কত বিচিত্র মূর্তি পুরাণকারগণ তুলে ধরেছেন পুরাণে। মার্কণ্ডেয় ঋষি মনুদের বর্ণনা প্রসঙ্গে, বিশেষত সাবর্ণি মনুর বর্ণনায় দেবীর বহুবিচিত্র কাহিনি গেঁথেছেন। দেবর্ষি নারদ যেমন ভগবানের মায়াশক্তিকে জানতে চেয়েছিলেন, তেমনই নারায়ণের কৃপালাভ করেও তাঁর মায়াশক্তির বিলাস দর্শনে উৎসুক হয়েছিলেন চিরজীবী ঋষি মার্কণ্ডেয়।

হিমালয়ের কোনও এক স্থানে ছিল তাঁর আশ্রম। একদিন পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে সন্ধ্যা নামছে দেখে তিনি দেবার্চনায় মনঃসংযোগ করলেন। হঠাৎই মেঘগর্জনের সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক। প্রলয়কালের মতো প্রবল বর্ষণ, বজ্র ও বিদ্যুৎসহ। তাঁর চোখের সামনেই প্রকৃতির রূপান্তর—চারদিকে জেগে উঠল চার সমুদ্র। সেই আকাশছোঁয়া সমুদ্রতরঙ্গে তিমিঙ্গিল এবং বিশালকায় ভয়ংকর সামুদ্রিক জীবগুলি অস্থির। একা মহামুনি আকুল হয়ে দেখলেন সেই মহাসমুদ্র—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল গ্রাসকারী জলরাশি—সেখানে অন্ধকার নেমেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জড়ীভূত ঋষি অন্ধ ও মূক প্রাণীর মতো বিচরণ করছেন। এইভাবে কত কত বৎসর অতীত হল তার হিসাব নেই। হঠাৎ একদিন এক দ্বীপাকার ভূমির ওপর তাঁর চোখে পড়ল সবুজ পাতা ও ফলে পূর্ণ এক বটবৃক্ষ। বটের পত্রপুটে শুয়ে এক বিচিত্র গোপালমূর্তি—পীতবসন পরা বালগোপাল নয়—সে এক অপূর্ব শিশু। ''করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তং/ বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানং বালং মুকুন্দং''—বালমুকুন্দ করপদ্ম দিয়ে নিজের ক্ষুদ্র পাদপদ্মটি মুখারবিন্দে ঢুকিয়ে—কল্পনায় বলা যায় বুড়ো আঙুলটি চুষছে।

বাৎসল্যরসের এই অপূর্ব চিত্রে ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করেছিলেন মার্কণ্ডেয় ঋষি। প্রসঙ্গত, ব্রহ্মাও একদিন মহামায়ার অন্বেষণে দেবতাদের নিয়ে বনে প্রবিষ্ট হয়ে দেখেছিলেন বিশাল বিল্ববৃক্ষতলে স্তূপীকৃত বিল্বপত্রের শয্যায় ঘুমিয়ে আছে এক শিশুকন্যা। যাই হোক, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ওই বালগোপালের মূর্তির কাছে অগ্রসর হওয়ামাত্র শিশুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই শিশুর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন, দেখলেন তাঁর পরিচিত এই বিপুল বিশ্ব। কয়েকবার এভাবে শিশুর বাইরে-

ভিতরে যাতায়াত করে তিনি দেখলেন পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, কাছেই তাঁর আশ্রম। একবার সেই অপূর্বসুন্দর শিশুকে বুকে তুলে নেবেন ভেবে অগ্রসর হতেই দেখলেন শিশুটি পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল। মনে মনে তিনি ভগবানের ওই আশ্চর্য মায়াশক্তিকে প্রণাম জানালেন। সেজন্য তিনি যখন মার্কণ্ডেয়পুরাণে সমস্ত মনুর বর্ণনা করছেন (চিরজীবী বলে সকল মনুর কথাই তাঁর জানা), তখন অষ্টম মনু সাবর্ণির প্রসঙ্গে ভগবানের সেই মায়াশক্তির বর্ণনা করেছেন—যাঁর কৃপায় সাবর্ণি 'মনু' হয়েছিলেন। সেও এক বিচিত্র কাহিনি। সে-রূপ নীলোৎপলদলে ফোটা বালমূর্তি নয়। সেই বিচিত্ররূপিণীকে আগে আমরা দেখিনি। সে মায়ের যোদ্ধৃমূর্তি, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনায় দিগন্ত কম্পিত করছে। দেবতারাও ভ্রমে পড়ে সেই বিরাট নারীর জ্যোতির্ময় হাতে তুলে দিচ্ছেন রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র। অনেক পরেই সংবিৎ ফিরল—এ যে মহামহিমময়ী মাতৃমূর্তি! তখন অঙ্গে উঠল বস্ত্র, গলায় দুলল মালা, দেবতারা অলংকারে অলংকারে সাজিয়ে দিলেন মায়ের প্রতিটি অবয়ব। মুখচন্দ্রমার ঝলকে ম্লান হয়ে গেল বিশ্বের সৌন্দর্য। কিন্তু মধুর বামাস্বরের পরিবর্তে ধ্বনিত হল 'হা হা' হাস্যরবে পরুষ কণ্ঠ ও গর্জন। এ কোন দেবী আকাশ-পাতাল জুড়ে নামলেন পৃথিবীর বুকে! কাত্যায়ন ঋষি সেই দেবীকে প্রথম পূজা অর্পণ করেছিলেন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। সেজন্য দেবীর নাম কাত্যায়নী।

এযুগের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন, এই বিরাট বিশ্বে এক মহাশক্তি আছেন যিনি নিজেকে নারী বলে মনে করেন। সেই মহামায়াকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধের জাল ফেলে যিনি মানুষকে মোহিত করেন, সেই মহাশক্তি এবার প্রসন্না হয়ে জীবকে মুক্ত করার জন্য অপূর্ব সাধনা করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মনে হয়েছিল, এবার শ্রীশ্রীমার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করবে। স্বয়ং মহামায়া সারদারূপে কৃপাসুমুখী হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন সহস্র নরনারীকে। স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ উভয়েই দর্শন করেছিলেন, বেলুড় মঠে মহাশক্তি পূজা চান। মৃন্ময়ী এবং সারদারূপিণী চিন্ময়ীর পূজা একত্রেই হয়েছিল। আচার্য স্বামীজী এই শক্তিময়ীর আবাহন করেছিলেন নারীকুলের দুর্দশা ঘোচাবার জন্য—যে-নারীশক্তির অবমাননা করে শক্তিহীন হয়েছে দুর্গত ভারত। ভারতের নমনীয় মাতৃশক্তি কি এবার এই বিরাট শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে প্রবাহের মতন নামবে? নহবতের সেই শ্রীরামকৃষ্ণপূজিতা পুঞ্জীভূত শক্তিকে প্রার্থনা করি, ''বিধেহি দেবি কল্যাণম্''—হে দেবী, সকলের মঙ্গল বিধান করো, সকলের অবিদ্যা দূর করো, মানুষের মন থেকে অসুরভাব নাশ করে জগতে শান্তিবারি বর্ষণ করো।

লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী—সকলকে
শারদীয়া মহাপূজার শুভলগ্নে পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই
সাদর নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
সকলের কল্যাণ হোক—
শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর চরণে এই প্রার্থনা।